বিনি পয়সার বায়োস্কোপ

(বড়োদের ছোটোবেলার গল্পসংকলন)

পুষ্পার্ঘ্য দাস

নিবেদন

মাঝে মাঝে কিছু কিছু গল্প হঠাৎ এমনভাবে নাড়া দিয়ে যায় যে ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে নিজের ডিএসএলআরটা বের করে ঝাড়পোঁছ শুরু করতে বাধ্য হই। স্ক্রিপ্ট লিখে উৎসাহী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে রিহার্স করতে শুরু করি। তারপর লোকেশন স্কাউটিং, সবার ফাঁক দেখে শুটিং ইত্যাদি ইত্যাদি...

বছরখানেক আগে একদিন সেরকমই একটা স্ক্রিপ্ট শেষ করে মনে হল, আরেহ্! এটাকে তো একটা গল্প হিসেবে লেখা যেতে পারে। লিখে ফেললাম 'গুলতি'। নেশা লেগে গেল। এরপর কিছুদিন ছাড়া ছাড়াই ইচ্ছে হতে লাগল গল্প লেখার। কত সব চরিত্র! তাদের নিজের খুশিমতো ভাঙছি, গড়ছি; বেশ মজা লাগছে। কত নতুন নতুন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছি মনে মনে। সেগুলো হয়তো কোনোদিন চোখেও দেখিনি। গল্প লেখার পদ্ধতিটা দারুণ উপভোগ করতে শুরু করলাম।

কোনো সৃষ্টি কেবল নিজের কুক্ষিগত করে রাখায় আমার বড় অনীহা। তাই এদিক-ওদিক পাঠাতে লাগলাম। ছাপাও হল কয়েক জায়গায়। মুদ্রিত, ওয়েব ম্যাগাজিন, ই-বুক— সবরকম।

কিছু গল্প আলাদা করে রেখেছিলাম। ইচ্ছে ছিল সেগুলোকে একত্র করে একটা পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি তৈরি করার। গত বছর লেখা শুরু করার সময় একবারের জন্যও ভাবিনি, এত কম সময়ে সেই আলাদা করে রাখা বারোটি গল্প নিয়ে তৈরি হবে আমার একক বই।

নিজের প্রথম বই বলে হয়তো একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি। সে হই, মাঝে মাঝে একটু অনিয়ম হলে ক্ষতি নেই। অফুরান ভালোবাসা আমার দাদাকে (পার্থপ্রতিম দাস) যে আমায় বই পড়ার নেশা ধরিয়েছে, আমার স্ত্রী-কে (সঙ্গীতা জানা দাস) যে আমায় উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে বরাবর, আমার মা (রেখা দাস) ও বাবাকে (প্রশান্ত কুমার দাস) যাদের আমি সবসময় পাশে পেয়ে থাকি। এ ছাড়াও অজস্র ধন্যবাদ বইবন্ধু পরিবারকে, যারা আমার মতো একেবারে আনকোরা একজনকে এত বড়ো সুযোগ দিয়েছে; বিশেষ করে সুদীপদা, শিবশঙ্করদা এবং নবনীতাকে। এঁরা ছাড়া এই জার্নিটা কখনোই এত সহজ হত না।

আমরা আমাদের কাজটুকু সম্পূর্ণ সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে করার চেষ্টা করেছি। সুধী পাঠক, এবার বাকিটা আপনাদের হাতে...

পুষ্পার্ঘ্য দাস
ডিসেম্বর, ২০২২

সূচিপত্র

গুলতি ১১

অবনী এবং কয়েকজন ১৮

মনখারাপের বাক্স ৩২

জানোয়ার ৪৬

উপহার ৫৫

আইসক্রিম ৬৬

ডাইনি ৭৫

প্রতিপক্ষ ৯০

ফাইট শিউলি, ফাইট ১০২

আজ বিকেলের ডাকে ১১২

সান্টা ক্লজ ১২৯

সিদ্ধার্থ একটা দাবানলের নাম ১৩৯

গুলতি

"হ্যালো।"

ফোনের ও-প্রান্তে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সে নীরবতা যেন কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যেন ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে হারানো কোনো স্মৃতি। এ প্রান্ত থেকে আবার শোনা গেল, "হ্যালো।"

ও-প্রান্ত যেন খুঁজে পেল মনের গভীরে চাপা থাকা দীর্ঘশ্বাস, "কেমন আছিস দিদি?"

এক ঝটকায় বছর পঁয়ত্রিশের তৃষার পুরো শৈশবটা যেন ওর বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল। স্মৃতির ঢেউ যেন তাকে আছড়ে ফেলল মাঝ দরিয়ায়। বিহ্বল হয়ে তার গলা থেকে বেরোল, "ভাই! কেমন আছিস তুই? কোথায় আছিস এখন? এতগুলো বছর কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি বল তো! কত খুঁজেছি তোকে আমরা সবাই!"

ও-প্রান্ত হেসে ফেলল, "আরে আস্তে আস্তে! বিষম লেগে যাবে তো! সব বলব তোকে। তার আগে শোন, তোর বাড়ি আসছি আমি পরশু। কটা দিন থাকতে দিবি তো?"

"মারব এক চাঁটি! দিদির সঙ্গে ফর্মালিটি করছিস? তাড়াতাড়ি আয় ভাই! কত বছর হয়ে গেল তোকে দেখিনি।"

"আসছি রে খুব শিগগিরই। দেখা হবে।"

আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা কেটে দিল পার্থ, তৃষার ভাই। পার্থ বরাবরই এরকম। যতটুকু নিজের বলার থাকবে, ততটুকু বলেই পালিয়ে যাবে।

আঠারো বছর বয়সে বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। তারপর চোদ্দো বছর কেটে গিয়েছে। তৃষা ভাবতেই পারেনি, পার্থ আর কোনোদিনও ফিরে আসবে। দিদি-ভাইয়ের মধ্যে ভালোবাসা ছিল অগাধ। তাই এতদিন পরেও এক লহমায় দুজন দুজনের গলা চিনে ফেলেছে। পার্থ চলে যাওয়ার বছর দুয়েক পর তৃষার বিয়ে হয়। বিয়ের আরও দু-বছর পর হাবুল জন্মাল।

আর এখন যে গল্পটা আমরা শুনব; সেটা হল হাবুল, আর হাবুলের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা তার এই মামার।

ডিসেম্বরের শেষের দিকের এক দুপুর। ক্লাস ফোরে পড়া হাবুলদের বাড়ির আদ্যিকালের পুরোনো দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। বাইরে রোদ খুব একটা তীব্র নয়। বরং মিঠেকড়া রোদ গায়ে ভালোই লাগছে। শীতের অলস দুপুরে গোটা পাড়াটাই যেন ঝিমোচ্ছে।

বাড়ির পেছনেই চারিদিকে গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর। হাবুল খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখতে পেল, ওর মামা পুকুরপাড়ে সিঁড়ির ওপর বসে কিছু একটা করছে। জন্মের পর থেকে এই তিনদিন আগে পর্যন্তও হাবুল ওর মামাকে শুধু ছবিতেই দেখেছে। তাও সে অনেক বছর আগের ছবি।

পার্থ এমন একটা ছেলে, যার পায়ে বেড়ি পড়িয়ে রাখে এমন সাধ্য কারও নেই। ছোটোবেলায় বাড়িতে থাকাকালীনও সে এদিক সেদিক চলে যেত। আবার দু-একদিন পর ফিরে আসত। সেই নিয়েই বাবার সঙ্গে ওর ঝামেলার সূত্রপাত। পাকাপাকিভাবে বাড়ি ছাড়ার পরও নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে, নিজের ভাগ্য, উপস্থিত বুদ্ধি আর কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

এবার দেশে ফিরে ঘটনাচক্রে রাঙামাসির সঙ্গে তার দেখা হয় এবং সেখান থেকেই তৃষার ফোন নম্বর পায়। ভাগনেটাকেও তো কোনোদিন চোখের দেখা দেখেনি। আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ার আগে সেই টানেই হয়তো দিদির বাড়ি আসা।

কপাল ঝাঁপানো চুল, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং, মাঝারি উচ্চতার

পার্থর চেহারা একটু রোগার দিকেই। শান্ত চোখ দুটো দেখে মনে হয়, ওখানে জমা আছে প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে দু-চার টুকরো হাবুল ইতিমধ্যে পেয়েছে। তাই এই ক-দিন মামা যেখানে, হাবুলও সেখানে। খুব ন্যাওটা হয়ে গেছে, কিছুতেই আলাদা করা যাচ্ছে না।

এখন সে পুকুরপাড়ে এসে দেখল, মামা গাছের ডাল ছুলে গুলতি বানানোয় ব্যস্ত। হাবুল আদুরে গলায় বলল, "মামু, আমি তোমার কাছে থাকি একটু?"

পার্থ ঘাড় ঘুরিয়ে হাবুলের দিকে দেখে বলল, "এই রে! আবার তুই ভর দুপুরে না ঘুমিয়ে, চুপিচুপি এখানে চলে এসেছিস? তোর বাবা মা কিন্তু এবার সত্যি সত্যিই আমায় বাড়ি থেকে বের করে দেবে।"

"ধুর, বাদ দাও তো। মা তোমাকে যা ভালোবাসে! আমাকে কোনোদিন হয়তো বের করে দিতেও পারে, তবু তোমাকে নয়।" বলতে বলতে হাবুল পায়ের কাছে পড়ে থাকা কিছু নুড়ি কুড়িয়ে পুকুরে ছুড়ে ছুড়ে ব্যাঙাচি করতে লাগল। ওই যে চ্যাপটা পাথরগুলো এমনভাবে ছোড়া হয়, যাতে জলে ডোবার আগে লাফিয়ে লাফিয়ে বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করতে পারে, সেটাই হল ব্যাঙাচি।

অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই ঠিকঠাক ব্যাঙাচি হচ্ছে না। একবার লাফিয়েই ডুবে যাচ্ছে। পাথর ছুড়তে ছুড়তেই হাবুল বলল, "জানো মামু, কাল রাতে তোমাকে নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে দারুণ ঝগড়া হয়েছে। বাবা বলছিল, 'এতদিন কোথায় কী করে এসেছে তার ঠিক নেই। এখন আবার এখানে কদ্দিন থাকবে কে জানে, যদি সারাজীবনের মতো জুড়ে বসে!' মা খুব কাঁদছিল, জানো?" পাথর ছোড়া থামিয়ে সে এবার মামার দিকে তাকিয়ে বলল, "মামু, তুমি যদি সবসময়ের জন্য থেকে যাও, তাহলে খুব মজা হবে, তাই না?"

পার্থ গুলতির দিক থেকে চোখ না সরিয়েই আলতো হেসে বলল, "তোর আর আমারই শুধু মজা হবে রে। তোর বাবা-মায়ের মধ্যে শুধু ফাইট হবে।"

হাবুল জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মামু, তুমি এত বছর ছিলে কোথায়?"

"সে কি আর এক জায়গায় ছিলাম রে? কত দেশ ঘুরেছি, কত কাজ

করেছি, কত লোকজনের সঙ্গে মিশেছি, কত ভাষা শিখেছি। আমার আবার কোনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে যে ভালো লাগে না!"

হাবুলের একটাও ঢিল একবারের বেশি লাফাল না। শেষ ঢিলটাও ডুবে যেতে হাবুল "ধুস" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামার পাশে এসে বসে পড়ল। বলল, "জানো মামু, আমার দ্বারা-না, কিস্‌সু হবে না। না আমি ভালো পড়া পারি, না পারি ভালো খেলতে। বন্ধুরা খেলতেও নেয় না। কিচ্ছু পারি না আমি।"

পার্থ মাথা তুলে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কে বলেছে তুই কিছু পারিস না?"

"সবাই বলে। বাবা, মা, স্কুলের বন্ধুরা, সবাই।"

দৃঢ় গলায় বলল পার্থ, "সবাই ভুল বলে।"

"না গো মামু, আমি সত্যিই পারি না। কেন যে পারি না! কত করে ঠাকুরকে ডাকি— ঠাকুর, আমাকে একটু বুদ্ধি দাও। বেশি পারার দরকার নেই, একটু পারলেই হবে। কিন্তু ঠাকুরও বোধহয় আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়।"

"বাঃ বাঃ, কিছু না হলেই অমনি ঠাকুরের দোষ, তাই না? তুই নিজে থেকে না করলে, ঠাকুর কী করবে শুনি? ঠাকুর কি তোর হাতে ধরে করিয়ে দেবে?" গুলতিটা হাবুলের দিকে এগিয়ে দিয়ে পার্থ বলল "এই নে, গুলতিটা ধর।"

গুলতি দেখেই আঁতকে উঠল হাবুল। বলল, "ও বাবা! ও গুলতি আমি চালাতে পারব না। আমার হাত খুব কাঁপে যে! নিশানা করার আগেই হাত থেকে গুলতি পড়ে যায়।"

পার্থ বাম হাতটা সিঁড়ির চাতালে চাপড়ে বলল, "আলবাত পারবি। কাল যে আমায় বলে বলে ওই দূরের ল্যাম্পপোস্টে ঢিল ছুড়ে লাগাচ্ছিলি!"

"সে তো হাত দিয়ে। গুলতি দিয়ে আমি পারি না তো!"

"আমি শিখিয়ে দেব তোকে। চেষ্টা করার আগেই পারবি না বলছিস কেন? তোকে গুলতি শেখাব, তারপর গোবরডাঙার মাঠের পেছনে যে জঙ্গল আছে, সেখানে নিয়ে যাব। সেখানে তোকে পশুপাখিদের সঙ্গে কথা বলতে শিখিয়ে দেব। ব্যাস! তারপর কে কী বলল, কী এসে যায় তাতে?"

হাবুল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি? তুমি জানো পশুপাখিদের সঙ্গে

কথা বলতে ?"

"আরে, নাহলে আর বলছি কী?"

পরক্ষণেই মুখ ব্যাজার করে ধীরে ধীরে স্বগতোক্তি করল হাবুল, "কিন্তু আমার যে খেলতেও খুব ইচ্ছে করে। বিকেল হলেই মনে হয়, এক ছুটে গোবরডাঙার মাঠে চলে যাই। কিন্তু কেউ খেলতেই নেয় না।"

পার্থ একগাল হেসে গুলতিটা পাশে সরিয়ে রেখে ভালো করে গুছিয়ে বসল। তারপর বলতে শুরু করল, "তাহলে তোকে একটা গল্প বলি শোন। ছোটোবেলায় আমিও তোর মতনই ছিলাম জানিস! মানে সবাই আমায় বলত যে আমি কিছুই পারি না। আর আমিও ভাবতাম, তাহলে বুঝি সত্যিই আমি কিছু পারি না। মনের মধ্যে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। শুধু আমার ঠাম্মা আমায় খুব ভালোবাসত। সবসময় সাহস জোগাত। বলত, 'আমার পার্থ অনেক কিছু পারে'।"

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলতে লাগল সে, "তখন বর্ষাকাল। একদিন বিকেলে বৃষ্টিটা জাস্ট থেমেছে। আকাশে উঠেছে অপূর্ব এক রামধনু। আর আমি মনখারাপ নিয়ে আমাদের বাড়ির পেছনের ধানজমির আলপথ ধরে একা একা হাঁটছি। হঠাৎ শুনি কে যেন আমায় ডাকল। আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। আবার দু-পা যেতে-না-যেতেই সেই ডাক। আমি তো ভিতু মানুষ। ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে মনে হল, ডাকটা যেন বেশ কিছু দূরে ধানজমির মাঝে যে কাকতাড়ুয়াটা আছে, সেখান থেকে আসছে।"

হাবুল একেবারে হাঁ করে গল্প শুনছে। ভাবনাগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে পার্থ আবার বলতে লাগলো, "জানি না ঠিক দেখলাম কি না, কিন্তু মনে হল, কাকতাড়ুয়াটা যেন আমার ঠাম্মাকে দু-হাত দিয়ে আটকে রেখেছে। ঠাম্মা সেখান থেকে খুব চেষ্টা করছে বেরোনোর। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। আমার তো ভয়ে হাত পা ঠান্ডা। একটুও নড়তে পারছি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর ঠিক তখুনি রামধনুটা ভর্ৎসনা করে উঠল, 'কাপুরুষ কোথাকার! হাঁ করে দেখছিস কী? যা, ঠাম্মাকে বাঁচা।' কথাটা শুনে, না জানি কোথা থেকে একগুচ্ছ দমকা হাওয়া এসে আমার বুকের ভেতর চুপসে যাওয়া